The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.205 - 216)
Published in October, 2025

রাঙ্গুনিয়ার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: পরিপ্রেক্ষিত গুমাই বিল

সাহানা পারভীন *

প্রতিপাদ্যসার: বাংলাদেশের দ্বিতীয় বাণিজ্যিক রাজধানী হিসাবে খ্যাত চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও জাতীয় অর্থনীতিতে এ অঞ্চলের কৃষির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে কর্ণফুলী, মুহুরী, ফেনী, হালদা, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাকখালী ও ইছামতী নদী কৃষিকে করেছে সমৃদ্ধ। চট্টগ্রাম জেলার শস্যভাণ্ডার খ্যাত রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত গুমাই বিল মূলত কর্ণফুলী নদী বিধৌত উর্বর ভূমি। গুমাই বিল এক সময় ছিল ঝিল। এই বিলজুড়ে ছিল মাছ। নানা প্রজাতির পাখিতে ভরপুর ছিল। ১৯৪৫ সালে রাঙ্গুনিয়ার কৃতি পুরুষ আব্দুল বারী তালুকদার গুমাই বিল সংস্কার করে প্রথমবারের মতো আধুনিক চাষাবাদ শুরু করেন। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে গুমাই বিলের জমি শুষ্ক মৌসুমে সেচের আওতায় আনা হয়। গুমাই বিলের জমিতে প্রতিবছর ইরি ও আমনের বাম্পার ফলন হয়। পাকিস্তান আমলে এই বিলে শুরু হয়েছিল ধান চাষ। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারগুলো এখানে আধুনিক সেচের ব্যবস্থা করে। ফলে সময় গড়ানোর সাথে সাথে বাড়ে এর ব্যাপকতা। গুমাই বিলের উৎপাদিত মোট খাদ্য শস্য স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় খাদ্য চাহিদাকে করেছে সমৃদ্ধ। গুমাই বিল রাঙ্গুনিয়ার কৃষি অর্থনীতিতে সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। শুরুতে এই বিলের আয়তন চার হাজার হেক্টরের বেশি থাকলেও বর্তমানে তা কমে তিন হাজার হেক্টরে নেমে এসেছে। আবাদি এই বিলে অপরিকল্পিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নিমার্ণের কারণে রাঙ্গুনিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। এছাড়া ইট ভাটা গড়ে উঠার কারণে এর আশেপাশে কৃষি জমিতে ধানের ফলনে প্রভাব পড়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে গুমাই বিলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উল্লেখ করে রাঙ্গুনিয়া তথা জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতিতে কীরূপ অবদান রেখে চলছে তা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

"হাতত্ কাঁচি কোঁরত দা
ভাত হাইলে রইন্যা যা।"
(হাতে কাঁচি, কোমরে দা, ভাত খেতে হলে রাঙ্গুনিয়া যাও।)

চট্টগ্রামের এই প্রবাদটি অতি পুরাতন। এই প্রবাদ বাক্যের অর্থ হল শুধু হাতে কাঁচি এবং কোমরে দা থাকলে রাঙ্গুনিয়ায় একজন লোক সহজে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এই প্রবাদ বাক্য রাঙ্গুনিয়ার কৃষিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদের প্রাচুর্য্যের ইঙ্গিত বহন করে। বিস্তীর্ণ সমভূমি চতুর্দিকে পাহাড় পর্বত ঘেরা বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ কর্ণফুলী, ইছামতী, শিলক নদী বিধৌত উর্বর পলল মৃত্তিকা, মৌসুমী জলবায়ু ইত্যাদি শ্যামল রাঙ্গুনিয়াকে একটি উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত প্রায় তিন হাজার হেক্টর আয়তনের দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধানের গোলা খ্যাত গুমাই বিল চট্টগ্রামের শস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত (মেহের ৯৩)। স্থানীয় লোকমুখে প্রচলিত, এই বিলের এক মৌসুমের উৎপাদিত ধান দিয়ে সারা দেশের আড়াই দিনের খাদ্যের চাহিদা মেটানো যায়। গুমাই বিল

* প্রভাষক, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্বে কৃষির অনুপযোগী জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মি. উইটেকার এবং স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জনগণের সহায়তায় গুমাই বিল সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালের ২৬ শে আগস্ট গুমাই বিল উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সংস্কারের মাধ্যমে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গুমাই বিল বর্তমান রূপ লাভ করেছে। এই বিলের উৎপাদিত শস্য রাঙ্গুনিয়া তথা দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিচিতি

রাঙ্গুনিয়া বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। চট্টগ্রাম জেলা সদর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এ উপজেলাটি আয়তনের দিক থেকে চট্টগ্রাম জেলার ষষ্ঠ বৃহত্তম এবং জনসংখ্যার দিক থেকে নবম জনবহুল উপজেলা। ১টি পৌরসভা ও ১৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলা। এর বর্তমান আয়তন ৩৬১.৫৪ বর্গ কি.মি.। এর উত্তরে কাউখালি উপজেলা (রাঙ্গামাটি)। দক্ষিণে চন্দনাইশ, পটিয়া ও বোয়ালখালি উপজেলা, পূর্বে কাপ্তাই, রাজস্থলী ও বান্দরবান সদর উপজেলা, পশ্চিমে রাউজান ও কাউখালি উপজেলা।

গুমাই বিলের আয়তন ও ভৌগোলিক অবস্থান

রাঙ্গুনিয়া কলেজ ছেড়ে পূর্বদিকে কাপ্তাই রোডের উত্তর পার্শ্বে, পূর্ব-পশ্চিমে ৩ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫ মাইল বিস্তৃত প্রায় ১০ হাজার একর জমি গুমাই বিল নামে পরিচিত। বর্তমান গুমাই বিলের মোট আবাদি জমির আয়তন ৩,২৩৮ হেক্টর বা ৮০০০ একর। রাঙ্গুনিয়ার নিশ্চিন্তাপুর পাহাড়ের পাদদেশে চন্দ্রঘোনা, মরিয়মনগর, হোসনাবাদ, স্বণির্ভর রাঙ্গুনিয়া, লালানগর ইউনিয়ন ও পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তর্ণ এলাকাজুড়ে গুমাই বিলের অবস্থান। এ বিল রাঙ্গুনিয়া উপজেলার মরিয়মনগর থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে রাঙ্গামাটি ঘেষা নিশ্চিন্তাপুর গিয়ে (উপজেলা কৃষি অফিস রাঙ্গুনিয়া)। দেশের বৃহত্তম চলন বিলের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত গুমাই বিল। গুমাই বিলের উত্তরে লালানগর বেড়িবাঁধ, দক্ষিণে মরিয়মনগর ও কর্ণফুলী নদী, পূর্বে চন্দ্রঘোনা ও ত্রিসুন্দরী ব্রিজ এবং পশ্চিমে রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা ও ইছামতী নদী।

নামকরণ

কথিত আছে, আরাকানী শাসনামলে ছৈয়দ-গ্রী নামে জনৈক বার্মিজ ভিক্ষু ও গোঁইয়ে নামে জনৈক উপাসক এক সাথে বার্মা থেকে এখানে আগমন করেন এবং রাঙ্গুনিয়া কলেজের দক্ষিণ পাশে পাহাড়ের নিকটবর্তী বিরাট এক দিঘীর পূর্ব পাড়ে অবস্থান করতে থাকেন।

তাদের শেষোক্ত ব্যক্তির নামানুসারে পরবর্তীকালে গোঁইয়ে-গোঁয়াইর–গুমাই বিল নামকরণ হয়েছে। রাঙ্গুনিয়া কলেজের দক্ষিণ পাশে যে বিরাট দিঘী আছে তার পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ মাঠে এখনো প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয় (বড়ুয়া ৫২)। এছাড়া 'আহাদিসুল খাওয়ানিন' গ্রন্থে গুমাই বিল জলে প্লাবিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

অন্য তথ্য মতে, গুমাই গৌড় শব্দের বিকৃত রূপ। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আমলে এর নাম গৌড়ের বিল ছিল। এ বিলের নিকটবর্তী বাসিন্দাদের বেশিরভাগ লোক গৌড় হতে আগত বলে দাবী করেন এবং এ বিলের নিকটবর্তী রয়েছে হোসনাবাদ ইউনিয়ন। তাই ধারণা করা হয় গুমাইয়ের পূর্বনাম গৌড়ের বিল (রাঙ্গুনিয়া স্টুডেন্ট ফোরাম ১৪)।

তাছাড়া কর্ণফুলী ঘুমিয়ে গিয়েছিল বলে (পূর্বে কর্ণফুলী নদীর স্রোতধারা গুমাই বিলের মধ্য দিয়ে প্রবহমান ছিল, পরবর্তীতে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়) এর নাম গুমাই কিংবা এখানে গোঁয়াই নামে একটি দেবমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে এর নাম গোয়াইর বিল বা গুমাই বিল নাম হল। চাটগাঁর ভাষায় এই বিলকে 'গোঁয়ার বিল' বলে (সাহা ৫২)।

উৎপত্তি ও গঠন

গুমাই বিল পূর্বে অনুচ্চ টিলা ও ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং গুমাই ঝিল নামে পরিচিত ছিল। গুমাই একসময় ঝিল থাকলেও রাঙ্গুনিয়ার উপর দিয়ে বয়ে চলা কর্ণফুলী নদী এবং গুমাইয়ের বুকে নেমে আসা প্রচুর পাহাড়ী ঝর্ণা ও ছড়ার পলি মিশ্রিত স্রোতধারায় গর্ত-খাদ, ঝোপ-জঙ্গল, টিলা-টংকর সব ভরাট হয়ে এক সমান হয়ে যায়। এছাড়া নিম্নাঞ্চল সবসময় জলমগ্ন থাকত। কারণ বাইনালার ছড়া, সোনাইছড়ি, মুন্দরী, কুরমাই, ইছামতী, বারঘোনিয়া, ঘাগড়া হ্রদ ও গুট্টাকার খাল গুমাইতে প্রবাহিত হয়। গুমাই বিল ও গুমাই ঝিল এই দুই অংশে বিভক্ত চট্টগ্রামের বৃহত্তম এই বিলের সংস্কার শুরু হয়েছিল ১৯১৬ সালে অবিভক্ত ভারতের শাসনামলে। রাঙ্গুনিয়ার স্থানীয় জমিদার প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী ও অর্জুন মাষ্টার প্রমুখ গুমাই বিলের সংস্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তারা বারঘোনিয়া পলি-বালি প্রবাহিত পাহাড়ি ছড়া (রাঙ্গুনিয়া-চন্দ্রঘোনা সীমান্তবর্তী) কেটে গুমাই বিলের জলাভূমি ভরাট করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অর্থ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তারা সফল হয়নি। এই মহৎ কাজের ব্যয়ভার বহন করে জমিদার প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী জমিদারী হারিয়েছেন এবং পরিচালক অর্জুন মাষ্টার পাগল হয়ে গিয়েছেন (বড়ুয়া ৫৩)।

অতঃপর ১৯৩৫ সালে বাবু বি. সি. নাথ এর নেতৃত্বে হাজী বদিউজ্জামান চৌধুরী, আব্দুল ওহাব সিকদার, সৈয়দ বাড়ীর রায় সাহেব, ললিত মোহন বড়ুয়া (সাহাব্দীনগর), রোহিনী রঞ্জন মুৎসুদ্দী ও উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী (নজরের টিলা), মৌলভী আহমদ (মরিয়মনগর) ও আজিজুর রহমান প্রমুখের সমন্বয়ে 'গুমাই বিল উন্নয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মি. উইটেকার সরকারী সাহায্যে গুমাই বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য রাঙ্গুনিয়া হাই স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে একটি খাল কেটে তা ইছামতী নদীর সাথে সংযোগ করেন। কিন্তু স্লুইচগেট না থাকায় আবার ইছামতী নদীর বন্যার জল প্রবলবেগে গুমাই বিলে প্রবেশ করত। ডি.সি. সাহেবের নামানুসারে এই খালের নামকরণ করা হয় উইটেকার খাল। তবে অর্থাভাবে এ খাল সম্পূর্ণ সংস্কার ও সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি। ফলে গুমাই বিলের দুঃখ দুর্দশা পূর্ববৎ থেকে যায়। ১৯৪৫ সালের ২৬ আগস্ট অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় মহাসভার চট্টগ্রাম বিভাগের সদস্য শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সদস্য মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ডা. ছানাউল্লাহ, অবিভক্ত ভারতের কংগ্রেস সহ-সম্পাদক বাবু সুশান্ত চৌধুরী, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী ফকির সেন প্রমুখসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞ বাবু জগদানন্দ বড়ুয়া উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। এই সভায় গুমাই বিল উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহিত হয় এবং সৈয়দবাড়ী নিবাসী আব্দুল ওহাব সিকদারকে সভাপতি এবং একই গ্রামের নিবাসী আব্দুল বারী তালুকদারকে সম্পাদক মনোনীত করে পুনঃ গুমাই বিল উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১৯৩৫ সালের অসম্পূর্ণ প্রকল্প পুনরায় সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা গুমাই বিলের দুঃখ দুর্দশা দেখে অনুতপ্ত হন এবং এ সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "গুমাই বিলের সংস্কার সাধন করিতে না পারিলে আমি (শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা) অবশ্যই অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় মহাসভার সদস্য পদ হতে ইস্তফা দিব।" ফলশ্রুতিতে গুমাই বিল সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত করতে Out Right Grand ও Relief Measure এর বঙ্গীয় চাঁদপুর ইরিগেশন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে সর্বপ্রথম উইটেকার খাল খনন ও পুনঃসম্প্রসারণের ফলে বাইনালার ছড়া, ইছামতী, ঘাগড়া ও হদ খাল এবং বারঘোনিয়া ছড়া দিয়ে পলি-বালি প্রবাহিত হয়ে গুমাই বিলের জলাভূমি ভরাট হয়ে যায়। ৬০ ফুট খাড়া পাহাড় কেটে বারঘোনিয়ার ছড়া গুমাই বিলের সাথে সংযোগ সাধনের ফলে সর্বনিম্ন গুমাই ঝিল ভরাট হয়ে কৃষি উপযোগী হয়ে ওঠে। এখনো সেই কাটা পাহাড়ের অবশিষ্টাংশ দণ্ডায়মান হয়ে সর্বনিম্ন গুমাই ঝিল মৌজার জলাভূমি ভরাটের সাক্ষী দিচ্ছে (বড়ুয়া ৫৪)।

গুমাই বিল সংস্কারে গুমাই পিতা আব্দুল বারী তালুকদারের অবদান

আব্দুল বারী তালুকদার রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত সৈয়দবাড়ী গ্রামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় ৯২ বছর বয়সে ১৯৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। শিশুকালে তার মাতৃবিয়োগ ঘটায় তিনি কানুনগোপাড়া মাতুলালয়ে লালিত হন এবং চট্টগ্রামের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সরোয়াতলী হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। যেহেতু তৎকালে কানুনগোপাড়া ও সরোয়াতলী এলাকা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি, সেই সুবাদে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ মাষ্টার দা সূর্যসেন এবং পরবর্তীতে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সান্নিধ্য লাভ করেন (কুদ্দুস ১০১)। তিনি কংগ্রেসের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ বিলের হাজার হাজার একর ফসলি জমি জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ হতো না বিধায় তিনি ৪ টি ইউনিয়নের (মরিয়মনগর, স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া, চন্দ্রঘোনা ও হোসনাবাদ) অগণিত জনসাধারণ ও চাষীদের অন্নকষ্ট লাঘবের ঐকান্তিক ইচ্ছায় রাঙ্গুনিয়ার সুধীজনদের দ্বারস্থ হয়ে গুমাই বিল সংস্কার কমিটি গঠন করে সরকারের ও 'Grow more food প্রকল্পের দৃষ্টি আকর্ষণের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তার এই উদ্যম প্রচেষ্টা উদ্ভট চিন্তাধারা হিসেবে সুধী সমাজ কর্তৃক উপহাসের সম্মুখীন হলে ১৯৩৫ সালে তিনি লিখিতভাবে ঘরে বসেই স্বঘোষিত নিম্নোক্ত গুমাই বিল সংস্কার কমিটি গঠন করেন (কুদ্দুস ১০২)।

সভাপতি- জনাব আব্দুল ওয়াহাব সিকদার (শিক্ষক ও সমাজসেবী)
সহ সভাপতি- জনাব সৈয়দ আহম্মদ আশরাফ (সমাজসেবী)
সাধারণ সম্পাদক- জনাব আব্দুল বারী তালুকদার (দোভাষী লঞ্চে ইন্সপেক্টর ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে এই চাকরি ছেড়ে গুমাই বিল সংস্কারে উদ্যোগী হন।)
সদস্য- জনাব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী (সমাজসেবী)
সদস্য- জনাব গণি মিয়া চৌধুরী (শিক্ষক ও সমাজসেবী)
সদস্য- জনাব সৈয়দ আহমদ তালুকদার (ব্যবসায়ী)
সদস্য- জনাব জাকির হোসেন (রেলওয়ে কর্মকতা, আব্দুল বারী তালুকদারের জামাতা)
সদস্য- জনাব মৌলানা আবুল খায়ের (শিক্ষাবিদ)
সদস্য- জনাব আহমদুর রহমান তালুকদার (সমাজসেবী)

এ কমিটির সব সদস্য তার আপন লোক ছিলেন। এইভাবে তিনি ঘরে বসে যে সংস্কার কমিটি গঠন করেন তার অনুলিপি ডাকযোগে ইরিগেশন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার 'Grow more food এর বিভাগীয় কর্মকর্তা, পাকিস্তানের খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা আব্দুস ছাত্তার, মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিব, লিয়াকত আলী খান, আব্দুর রব নিস্তার, ফিরোজ খান নুন ও আতাউর রহমান খান প্রমুখদের পাঠান। এইভাবে তিনি ঘরে বসেই স্বঘোষিত কমিটির এজেন্ডা তৈরি করতেন এবং অনুলিপি বারবার সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠাতেন। কোন কোন সময় ২০/২৫ শব্দের জরুরী টেলিগ্রামও পাঠাতেন। তার এরূপ উদ্যোগে হেলিকপ্টার যোগে দেশী-বিদেশী সাহায্য সংস্থা থেকে অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারগণ এসে গুমাই বিল জরিপ ও পরিদর্শন শুরু করেন। যেহেতু গুমাই বিলের ছড়া ও ভরাট খাল সম্পর্কে তার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল সেহেতু তিনি আগত অফিসারদের পানি নিষ্কাশনের নিজস্ব ফরমুলায় দিক নির্দেশনা পেশ করতেন। তার পরামর্শক্রমে এ সমস্ত ছড়া ও খালের সংস্কার ও মাটি ভরাট কাজ শুরু হয়। বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রয়াসে মোহাফেজ খাল ও কাটাখালী খাল দুটি সংস্কার করে কর্ণফুলী নদীর সাথে সংযোগ করা হয়। বর্ষাকালে কর্ণফুলী নদীর বন্যার পানি যাতে গুমাই বিলে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য উক্ত খাল দুটির মোহনায় স্লুইস গেইট নির্মাণ করার সুপারিশ করেন। ১৯৩৫ সালের অসম্পূর্ণ প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য ১৯৪৫ সালে আব্দুল বারী তালুকদারকে সম্পাদক মনোনীত করে গুমাই বিল উন্নয়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হলে তার সুপারিশে উইটেকার খালের মোহনায়

স্লুইস গেইট নির্মাণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে তিন খালের মাধ্যমে (মোহাফেজ খাল, কাটাখালী খাল ও উইটেকার খাল) গুমাই বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন শুরু হয়। বিলকে চাষাবাদের উপযোগি করে তুলতে তিনি মোঘল হাটের উত্তর পার্শ্বের ভরাট ঘাঘড়া খালটি সংস্কার ও গভীর করে খনন করার পরামর্শ দেন।

আব্দুল বারী তালুকদার তার ২২ কানি সম্পত্তি পানির দরে বিক্রি করে সে টাকা গুমাই বিল সংস্কারে ব্যয় করেছেন। তিনি ঘাঘড়া বনাম হদ খাল সংস্কার করে ইছাখালী নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন যাতে বর্ষাকালে ইছামতি নদীর (চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়াতে কর্ণফুলী নদীর একটি উপনদীর নাম ইছামতী। ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি রাজানগর, পারুয়া, হোসনাবাদ, রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়ন দিয়ে প্রবাহকালে বেশ কয়েকটি ছোট খাল ও ছড়া নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।) বন্যার পানির সাথে পলিমাটি ঢুকে অতি অল্প সময়ে গুমাই বিলের নিম্নাংশ ভরাট হয়ে যায়। তার এ পরিকল্পনায় সরকারী অনুমোদন লাভ করলেও হোসনাবাদ ও গুমাই বিলের বৃহত্তম চাষী গোষ্ঠী ব্রহ্মোত্তর গ্রামের লোকেরা এর বিরোধিতা করে। তাদের ধারনা, গুমাই বিলের সাথে ইছামতি নদীর সংযোগ হলে ইছামতি নদী গতিপথ পরিবর্তন করে গুমাই বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্রহ্মোত্তর গ্রামের লোকেরা তাকে অপহরণ করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। পরে ব্রহ্মোত্তরের বড় মৌলানা বাড়ির জনাব ওয়াকিল আহমদ সাহেবের মধ্যস্থতায় তিনি নিষ্কৃতি পান। ইতোমধ্যে সরকারী পর্যায়ে হদ খাল খনন সম্পন্ন হয় এবং এর ২-৩ বছরের মধ্যেই বর্ষাকালীন ইছামতি নদীর বন্যার পানির সাথে পলিমাটি ঢুকে গুমাই বিলের নিম্নভূমি একদম ভরাট হয়ে চাষোপযোগী হয়ে যায়। এতে ব্রহ্মোত্তর, নিশ্চিন্তাপুর, হোসনাবাদ ও চন্দ্রঘোনার চাষীরা খুশি হয়ে তালুকদার সাহেবকে সংবর্ধনা দেয়। অত:পর গুমাই বিলের চাষাবাদ বৃদ্ধিতে তিনি আরো দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন-

১. মোহাফেজ খাল ও কাটাখালী খাল দুটির মোহনায় স্লুইস গেইটের নিচে বড় ধরণের পাম্প মেশিন বসিয়ে কর্ণফুলী নদীর পানি উঠিয়ে গুমাই বিলে সংস্কার করা ছোট ছোট খাল ও ছড়ায় পানি ভর্তি করে, যাতে চাষীরা ছোট পাম্প মেশিনের সাহায্যে তাদের জমিতে পরিমিত পানি দিতে পারে।
২. গুমাই বিলের উত্তর সীমানায় বৃহৎ জলাধার নিমার্ণ করে সংকটকালীন পানি সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ (কুদ্দুস ১০৩)।

তার পরিকল্পনা দুটি সরকারী অনুমোদন লাভ করে। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গুমাই বিলে ইরি ধানের চাষ সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়। ১৯৬৮ সালে তালুকদার সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর জনাব মোনায়েম খানকে গুমাই বিল পরিদর্শনে নিয়ে আসেন। গুমাই বিলের বিখ্যাত কাজীর দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে সুউচ্চ এক মঞ্চ তৈরী করে গভর্নরকে চাষাবাদ দেখানোর ব্যবস্থা করে। গভর্নর এ বিরাট এলাকার চাষাবাদ দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হন এবং উপস্থিত জনতাকে চাষাবাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। এ সময় জনসেবায় স্বীকৃতি স্বরূপ আব্দুল বারী তালুকদারকে 'Father of the Gumai' উপাধিতে ভূষিত করেন (কুদ্দুস ১০৪)। সেই থেকে আব্দুল বারী তালুকদার 'গুমাই পিতা' নামে সমধিক পরিচিত। আজকের শস্য শ্যামলা গুমাই বিল যে বাস্তবিক পক্ষে উৎপাদনশীল হয়ে উঠেছে এটা তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল।

গুমাই বিলে প্রথম ইরি ধানের চাষ

১৯৬২ সালের বন্যায় গুমাই বিলের ধান নষ্ট হওয়ায় অবিলম্বে ইরি ধান চাষের প্রচারণা কার্য শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম উফশী জাতের ধান (আইআর ৮) মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদ শুরু হয়। খাটো আকৃতির এই উফশী ধান থেকে প্রতি হেক্টরে ৫-৬ টন (বিঘা প্রতি ১৮-১৯ মণ) ফলন পাওয়া যায়। তখন থেকে উফশী ধান লোকমুখে ইরি ধান নামে পরিচিতি লাভ করে। এতে বিভিন্ন শ্লোক প্রচলিত ছিল। যেমন-

'চাষ কর ইরি
বাড়বে দেশের ছিরি।' (ছিরি বলতে সৌন্দর্যকে বুঝানো হয়েছে)

এসময়ে রাঙ্গুনিয়ার কবিয়াল শিশু আচার্য ইরি ধানের গান গেয়ে ৩০০ টাকা পুরস্কার পায় (চক্রবর্তী ৫৫)। এতে গুমাই বিল কেন্দ্রিক স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া গড়ার লক্ষ্যে দরিদ্র কৃষকেরা ছোট ছোট সমবায় গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইরি ধানের আবাদের মাধ্যমে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তাদের আমব্রেলা সংগঠন রাঙ্গুনিয়া 'কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি' খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে (আলম ১৮)। ১৯৬৬ সালে চন্দ্রঘোনার লিচুবাগানে 'চাষী সমবায় সমিতি' স্থাপিত হওয়ার পর মাহবুবুল আলম চাষীর উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে গুমাই বিলে ইরি ধানের চাষ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়। অতঃপর রাঙ্গুনিয়ার পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরি ধান চাষের প্রভাব পড়ে এবং পরবর্তীকালে এ প্রভাব চট্টগ্রামের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে (খালেদ ৮৪)। রাঙ্গুনিয়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অধ্যক্ষের নেতৃত্বে ডেপুটি কমিশনার সালাহউদ্দীন ও চাষী সমবায় সমিতির ডেপুটি ডাইরেক্টর আলম সাহেবের উপদেশ ও প্রেরণায় গুমাই বিল জুড়ে আবাদ হয় ইরি ধানের (রহমান ৮২)। এসময়ে গুমাই বিলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু হয়। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কারিগরি বিভাগের ছাত্ররা এসে গুমাই বিলের মাটি পরীক্ষা করে জরিপ চালায় এবং কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়ে কৃষকদের সাথে আলোচনা করে। এতে রাঙ্গুনিয়া ইরি ধান চাষের আদর্শ স্থানে পরিণত হয় এবং গুমাই বিলের নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গভর্নর সাহেব ঘোষণা করেন,

"ঢাকার বিজ্ঞান সম্মেলন যেটা কল্পনা করতে পারেনি আমার রাঙ্গুনিয়ার ছাত্র ও কৃষক ভাইয়েরা তাতে অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছে। গুমাই বিলের জন্য দেড় লক্ষ টাকা এবং রাঙ্গুনিয়ায় একটি কৃষি ইনস্টিটিউট এর জন্য দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।"

প্রতিদিন কৃষিকাজে অনুপ্রেরণা দিতে রাঙ্গুনিয়া স্কুল ও কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরা সকাল সন্ধ্যা কৃষকদের সাথে কাজ করে। ১৯৬৮-১৯৬৯ এ সময়ে রাঙ্গুনিয়া স্কুলের ছাত্ররা ২ একর জমিতে ২০০ মণ ইরি ধান পেয়েছে এবং রাঙ্গুনিয়া কলেজের ছাত্ররা পেয়েছে একর প্রতি ১২০ মণ। প্রাথমিক অবস্থায় গুমাই বিলে একর প্রতি ১১০ থেকে ১১৮ মণ ইরি ধান উৎপন্ন হয়েছে (চক্রবর্তী ৫৬)।

গুমাই বিলে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর দেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের আধার। উর্বর ভূমি এবং অফুরন্ত পানি সম্পদ থাকার পরও খাদ্য ঘাটতি ছিল নিয়মিত ঘটনা। খাদ্য ঘাটতি, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ১৯৭৪ সালের দূর্ভিক্ষ ও খরা সহ বিভিন্ন কারণে সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ করেন। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প সেই প্রকল্পগুলোর একটি। নদী তীরবর্তী অঞ্চলের উর্বর মাটি, প্রয়োজনীয় পানি আর কৃষি কাজের সুবিধা থাকার কারণে কর্ণফুলী নদীর তীরে এই প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী ইনক এবং বাংলাদেশের রহমান এন্ড এসোসিয়েটস লি. এর মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা রির্পোট তৈরি করে। অতঃপর সেচ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আই.ডি.এ ঋণ চুক্তি ৬০৫-বিডি এর অধীনে ১৯৭৫-৭৬ সালে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয় যা ১৯৮৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্ণফুলী, ইছামতী ও বিভিন্ন শাখা নদীর পানি সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রকল্প এলাকার কৃষি জমি সারা বছর চাষাবাদের আওতায় এসেছে। ফলে ইছামতী ইউনিটের স্কীমভুক্ত প্রান্তিক কৃষকেরা চাষাবাদ করে সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ১২ সদস্য বিশিষ্ট ইছামতী পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন দ্বারা গুমাই বিলের উন্নয়ন বিষয়ক

যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয় (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর)। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতী ইউনিট) গুমাই বিলে তাদের সেচ ব্যবস্থার যে কার্যক্রম সম্পন্ন করে তা নিম্নরূপ-

এক নজরে কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতী ইউনিট)

প্রকল্পের নাম	:	কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতী ইউনিট)
প্রকল্পের অবস্থান	:	চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় অবস্থিত
প্রকল্পের উদ্দেশ্যে	:	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প
প্রকল্প এলাকায় মোট জমি	:	৩,২৩৮ হেক্টর
প্রকল্প এলাকায় সেচযোগ্য জমি	:	২,২৮০ হেক্টর
প্রধান অঙ্গসমূহ		
মেইন পাম্পিং প্ল্যান্ট	:	০১ টি (৫গুণ ৩০ কিউসেক)
রিলিফ পাম্পিং প্ল্যান্ট	:	০১টি (২গুণ ৩০ কিউসেক)
রেগুলেটর:	:	৪টি
খাল পুনঃখনন	:	৩৬.৫০ কি.মি.
খাল খনন	:	৬.৫০ কি.মি.
বাঁধ নির্মাণ	:	৩৯.২৫ কি.মি.
ব্রীজ ও ফুট ব্রীজ নির্মাণ	:	১৮টি
গ্র্যাভিটি আউটলেট	:	১৯টি
ড্রেইন আউটলেট	:	১৩টি
স্বল্প উত্তোলক পাম্প (LLP)	:	পরিকল্পিত ৮৬ টি, ক্ষেত্রায়ন ৭২ টি
চেক স্ট্রাকচার কাম ব্রীজ	:	০৪টি
ফ্লাড বাইপাস	:	০২টি
২০২১-২২ সালের সেচের তথ্য	:	লক্ষ্যমাত্রা-২২৮০ হেক্টর, সাফল্য–২২৮০ হেক্টর
প্রকল্প ব্যয়	:	৪৮০৫.০০ লক্ষ টাকা
সময়	:	১৯৭৫-৭৬ অর্থবছর হতে ১৯৮২-৮৩ অর্থবছর।

গুমাই বিলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুমাই বিল। এ বিলের উৎপাদন ও অর্থনীতির গতিপ্রবাহ চট্টগ্রামকে করেছে সমৃদ্ধ। এক সময় এই গুমাই বিলের প্রায় অনাবাদী থাকত এবং বন্যায় শস্যহানী হত। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ গুমাই বিল বর্ষাকালে বিরাট সবুজ মাঠ এবং অগ্রহায়ন মাসে বিস্তীর্ণ সোনালী রূপ ধারণ করে। গুমাই বিলে চীনা ইরি, ইরি-৮, বি. আর-৪, দিনাজপুরি পাইজাম, বাদশাভোগ, বি. আর-১১, পান্‌জা ধান, আউশ ধান, বিনি ধান, ধলি চাক্কল, বৈলাম, চিন্নাল, বেতী, বালাম, গচ্ছা, গেলং প্রভৃতি ধান চাষ হয়। বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট কর্ণফুলী সেচ প্রকল্পের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ইছামতী ইউনিট এর আওতায় অত্র এলাকায় বন্যা প্রতিরোধ, প্রয়োজনীয় উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের ফলে রাঙ্গুনিয়া একটি শস্য উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হয়েছে। সরকার কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয় করে মজুদ করার জন্য রাঙ্গুনিয়ার ইছাখালীতে শস্য গুদাম নির্মাণ করেছে (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার লোকন বিশ্বাস)। এছাড়া বাইনালার ছড়া, সোনাইছড়ি খাল, সুন্দরী খাল, কুরমাই খাল, কুলকুরমাই খাল, ইছামতী খাল, বারঘোনিয়া খাল, ঘাগড়া খাল, হদ খাল ও গুট্টাখার খাল গুমাইতে প্রবাহিত

হওয়ায় তা চাষাবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গুমাই বিলে ধান কাটার উৎসবের সঙ্গে বাড়ে শ্রমিকদের কদর। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকরা ধান কাটার জন্য রাঙ্গুনিয়ায় আসে। গুমাই বিল থেকে ধান কাটা শেষ করে বাড়িতে ফেরার সময় যাতে বাড়তি অর্থ উপার্জন করে নিয়ে যেতে পারেন তার জন্য আছে শ্রমিকদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। গুমাই বিল বৃহত্তর চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

গুমাই বিলে বছরে দুই মৌসুমে বোরো ও আমন ধানের চাষ হয়। এছাড়া বর্তমানে উন্নত বীজ যেমন- ব্রি ধান-১০০, ব্রি ধান-৯২, ব্রি ধান-৮৭, ব্রি ধান-৮৯, ব্রি ধান-৭৫, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২ চাষ হচ্ছে গুমাই বিলে। এসব ধানের ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে বোরো ও আমন মৌসুমে ১ একর জমিতে ৭০ মণ ধান উৎপন্ন হয় (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার আব্দুল নবী)। এ বিলের উৎপাদিত শস্য স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে চট্টগ্রাম তথা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিম্নের সারণীতে গুমাই বিলে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ উল্লেখ করা হল-

অর্থবছর	বোরো মৌসুম	আমন মৌসুম
২০১৭-২০১৮	১৫,৬৮০ মেট্রিক টন	১৪,৭২০ মেট্রিক টন
২০১৮-২০১৯	১৬,০০০ মেট্রিক টন	১৫,৩৬০ মেট্রিক টন
২০১৯-২০২০	১৬,৯৬০ মেট্রিক টন	১৬,০০০ মেট্রিক টন
২০২০-২০২১	১৭,৬০০ মেট্রিক টন	১৬,৯৬০ মেট্রিক টন
২০২১-২০২২	১৮,৫৬০ মেট্রিক টন	১৭,৬০০ মেট্রিক টন

(সূত্রঃ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা কৃষি অফিস)

গুমাই বিলকে কেন্দ্র করে ৬টি ইউনিয়নের প্রায় ৯০% লোক কৃষিকাজের সাথে জড়িত। নিম্নে এর একটি সারণী দেওয়া হল-

আদমশুমারী বছর	জাতীয় জনসংখ্যা	চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা	রাঙ্গুনিয়া উপজেলার মোট জনসংখ্যা	গুমাই কেন্দ্রিক মোট জনসংখ্যা
২০০১	১২,৪৩,৫৫,২৬৩ জন	৬৯,৬৬,৪৫০ জন	৩,০১,২৭২ জন	৮০,৯৬৭ জন
২০১১	১৪,০৪,৪৩,৬৯৭ জন	৭৯,১৩,৩৬৫ জন	৩,৩৯,০০৪ জন	১,০২,৫৩৭ জন
২০২১	১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন	৯১,৬৩,৭৬০ জন	৩,৯২,৯০৩ জন	১,২৬,৯০৭ জন

(সূত্রঃ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)

গুমাই বিলের সামাজিক গুরুত্ব

১৯১৫ সালে রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কাপ্তাই সড়ক তৈরি ও কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতী ইউনিট) কর্তৃক গুমাই বিলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে গুমাই কেন্দ্রিক একটি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠে। বর্তমানে গুমাইকে কেন্দ্র করে রাঙ্গুনিয়ার প্রশাসনিক অঞ্চল অবস্থিত। গুমাই বিল কেন্দ্রিক ইউনিয়নসমূহ যেমন-স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া, হোসনাবাদ, লালানগর, মরিয়মনগর ও সৈয়দবাড়ী বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। লালানগর এর আছাদ আলী চৌধুরী বাড়ী, কেরাণী বাড়ী, মাতব্বর বাড়ী এসব ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলো শিক্ষায় প্রভাব-প্রতিপত্তিতে পূর্ব থেকে যথেষ্ট অগ্রণী ছিল (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার সৈয়দ মনজুর মোরশেদ)। বর্তমানে গুমাই বিলের

কৃষক পরিবারের অনেক সন্তান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছে। উত্তর রাঙ্গুনিয়ার (লালানগর, হোসনাবাদ, স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া) হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত কৃষি নির্ভর। যাদের জমি নেই তারা বর্গাচাষ করে কিংবা জোতদার-তালুকদারদের চাষাবাদে কামলা খেটে জীবন নির্বাহ করে। তাদের ভাতের অভাব নেই বললেই চলে। তখনকার সময়ে বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে ফসলের হানি হতো। আশানুরূপ ফসল না পাওয়ায় কৃষকরা অভাব অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতো। বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষাবাদ করাতে ফসলের উৎপাদন আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গুমাই বিলকে কেন্দ্র করে যে জনবসতি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে বিভিন্ন পেশার মানুষের বসতি আছে। কৃষিকাজের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত। অর্থাৎ বর্তমানে গুমাই বিল কেন্দ্রিক একটি উন্নত সমাজ পরিলক্ষিত হয়। গুমাই বিলকে কেন্দ্র করে চারটি এনজিও (ইপসা, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ব্র্যাক, কারিতাস) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাসমূহ (সোনালী, রূপালী, অগ্রণী) তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার ফলে ক্ষুদ্র ঋণ এবং ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকরা পূর্বের তুলনায় বেশি চাষাবাদ করার সুযোগ পাচ্ছে। গুমাই বিল কেন্দ্রিক ইউনিয়ন সমুহের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং জনগনের উন্নত জীবন যাপন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গুমাই বিলকে কেন্দ্র করে গ্রামগুলো সমৃদ্ধ হচ্ছে।

গুমাই বিল কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার নিম্নে সারণী আকারে তুলে ধরা হলো-

ইউনিয়ন	শিক্ষার হার	উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
চন্দ্রঘোনা	৫৭%	কদমতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৮৭) মাদ্‌রাসা-এ তৈয়বিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া (১৯৭৭)
মরিয়ম নগর	৬১%	মরিয়ম নগর ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা (১৯৭৫)
হোসনাবাদ	৫১%	দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া	৪৯%	মজুমদারখীল উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৭)
লালানগর	৪৬%	উত্তর রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪২)
পৌরসভা (৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড)	৫৯.০৮%	রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৫) রাঙ্গুনিয়া সরকারি কলেজ (১৯৬৩)

(সূত্র: রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)

গুমাই বিলের ক্ষতিকর প্রভাব

দিন গড়ানোর সাথে সাথে গুমাই বিলের আয়তন কমে আসছে। ঐতিহ্যবাহী এ বিলে গড়ে উঠেছে সর্বনাশা ইটভাটা। ভাটায় মাটির জোগান দিতে প্রতি বছর কেটে নেয়া হচ্ছে গুমাই বিলের ফসলি জমির টপ সয়েল। আবার কোথাও কোথাও মাটি সংগ্রহের জন্য জমি কিনে বিশালাকার করে পুকুর খনন করা হচ্ছে। অন্যদিকে এইসব ইটভাটার জ্বালানি আসে রাঙ্গুনিয়ার পাহাড়ি এলাকা থেকে। ফলে একদিকে যেমন পাহাড়-বন ধ্বংস হচ্ছে অপরদিকে উর্বরতা হারাচ্ছে জমি। ইটভাটার কালো ধোঁয়াজনিত প্রতিকূল প্রভাবের শিকার হয় গুমাই বিলের প্রায় ৬০০০ একর জমির আমন ও ইরি ধানের চাষাবাদ। এছাড়া গুমাই বিল দখল করে গড়ে উঠছে নানা স্থাপনা। বিলের ধানের জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে ভরাটপূর্ব গড়ে তোলা হচ্ছে বসত-বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা। প্রশাসনের নজরদারির অভাবে বেপরোয়া ভূমিদস্যুরা। আবাদি এই বিলে অপরিকল্পিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণের কারণে রাঙ্গুনিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। চন্দ্রঘোনা ছুফি পাড়া গ্রামের কৃষক নুরুল আলম বলেন,

"গুমাই বিলে শত শত কৃষকের জমি রয়েছে। তবে এসব কৃষিজমি দিনদিন কমে যাচ্ছে। বিত্তবানরা কৃষিজমি নিয়ে বাণিজ্যে মেতে উঠিছেন।" তাছাড়া অব্যাহত বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে কাপ্তাই লেকে পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে কাপ্তাই বাধঁ ঝুঁকিমুক্ত রাখতে ছেড়ে দেওয়া পানিতে প্লাবিত হয় গুমাই বিলের কমপক্ষে ৩০০০ একর জমির বীজতলা ও ধানক্ষেত। ১৯৭৪ সালে জুলাই মাসে কাপ্তাই বাধেঁর পানিতে গুমাই বিল প্লাবিত হলে রাঙ্গুনিয়ার মুক্তিযুদ্ধকালীন থানা কমান্ডার ছালেহ আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে টেলিগ্রাম করে, কারণ এসময় পুরো বিল জুড়ে পাকা ধানে ভরপুর ছিল। বঙ্গবন্ধুকে করা এই টেলিগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হলে গুমাই বিল জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি পায়। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তার চীফ সেক্রেটারী রুহুল কুদ্দুসকে নির্দেশ দেন, "দেশের মানুষ খাবার পাচ্ছেনা, ওদিকে ১০,০০০ হেক্টর গুমাই বিল পানিতে ডুবে আছে।" বঙ্গবন্ধুর এমন নির্দেশে রুহুল কুদ্দুস সরাসরি ছালেহ আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করে কিভাবে বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ করে গুমাই বিলকে রক্ষা করা যায় সে ব্যপারে আলোচনা করে। এভাবে কাপ্তাই বাধেঁর পানিতে গুমাই বিল বারবার প্লাবিত হলে ১৯৭৪ সালে Reserver Offeration Committee (ROC) গঠন করা হয়। এ কমিটি বিভাগীয় কমিশনারকে চেয়ারম্যান, হিলট্র্যাক্ট ও চট্টগ্রামের দুই জেলা কমিশনারকে মেম্বার, কাপ্তাই বাঁধের প্রজেক্ট ম্যানেজার, অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সালেহ আহমেদকে সদস্য করে গঠিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত হল-

তারা একটি চার্ট তৈরি করবে যাতে সামুদ্রিক ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বাঁধের উচ্চতা কত, কোন মাসে কত মিলিমিটার বৃষ্টি হচ্ছে প্রভৃতি উল্লেখ থাকবে। এই কমিটি প্রতিমাসে একটি সভার আয়োজন করবে এবং একমাসে চট্টগ্রামে সভা হলে অপরমাসে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সদস্যরা সভায় কাপ্তাই প্রজেক্ট রিভিউ করবে। ১৯৭৪ সালের পরে এই কমিটি নিয়মিত বিভিন্ন সভার আয়োজন করলেও পরবর্তীতে তাতে রাজনৈতিক বিভিন্ন গোলযোগ প্রবেশ করলে এ কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ছালেহ আহমদ)। গুমাই বিল রক্ষায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

যেমন- একটি ম্যাপ তৈরি করা, কৃষিজমি বেচা-কেনায় শ্রেণি পরিবর্তনের সময় কঠোরতা আরোপ, ইটভাটার ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন ইত্যাদি।

গুমাই বিল কেন্দ্রিক সম্ভাবনা

ধানের গোলাখ্যাত গুমাই বিলের ৪,৫০০ হেক্টর জমির মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১০০০ হেক্টর জমি এখনো অনাবাদি রয়েছে। পূর্বে গুমাই বিলে ফসল উৎপাদনে সেচ ব্যবস্থা ছিল প্রধান প্রতিবন্ধকতা কিন্তু বর্তমানে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে অনাবাদি জমি গুলো চাষের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছেনা। এছাড়া শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে অনাবাদি জমিগুলো চাষে কৃষকরা আগ্রহ প্রকাশ করে না। দুই মৌসুমে উৎপাদিত ধান ছাড়া এ বিলে অন্য কোন শস্যের আবাদ হয় না (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ফরিদ আহমদ)। ফলে বছরের নির্দিষ্ট একটা সময় উর্বর গুমাই বিল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। তাই সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে গুমাই বিলকে আরো উৎপাদনশীল করা যায়। যেমন-

১. রবিশস্য উৎপাদন।
২. সরিষা চাষ।
৩. মধু চাষ।
৪. মৎস্য চাষ।
৫. শীতকালীন সবজি চাষ: গুমাই বিলকে কেন্দ্র করে যেসব ইউনিয়ন আছে সেসব ইউনিয়নের জনগণ এবং রাংগুনিয়ার প্রায় ৭০% মানুষের অন্যান্য স্থানের সবজির উপর নির্ভর করতে হয়। তাই শীত মৌসুমে বিভিন্ন সবজির চাষ করা হলে তা স্থানীয়দের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

৬. পাখিদের অভয়ারণ্য: প্রতিবছর ইরি এবং আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিলে পানি সেচ দেওয়ার স্থানে খাবারের জন্য বিচরণ করতে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক। স্থানীয় ভাষায় এসব বক পাখিকে 'ধলা বোঘা' বলা হয়। চন্দ্রঘোনা-কদমতলী ইউনিয়নের আধুর পাড়া অংশে গুমাই বিলে গেলে এই দৃশ্য দেখা যায়। দেখে মনে হয় এই বিল যেন বকের অভয়াশ্রম। এছাড়া সন্ধ্যা হলেই এ বিলে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখির দেখা মিলে। গুমাই বিলে প্রায় ১২টির মতো খাল প্রবহমান আছে। খালের পাড়ে বনায়নের মাধ্যমে পাখিদের অভয়ারণ্য গড়ে তুললে ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণ হ্রাস পাবে। অন্যদিকে গাছের ছায়ায় কৃষকরা বিশ্রাম নিতে পারবে।
৭. বোয়াল মাছের প্রজনন কেন্দ্র: এপ্রিল-মে মাসের বৃষ্টিপাতে গুমাই বিলে বড় বড় বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। এসব বোয়াল মাছের ওজন গড়ে ২০-৩০ কেজি। এখানে বোয়াল মাছের অভয়াশ্রমের মাধ্যমে প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করা যায়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। কৃষির মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বর্তমানে আধুনিক সেচব্যবস্থা এবং উন্নত বীজের অধিক ফলনের কারণে গুমাইয়ের বেশিরভাগ অংশে ভালো ফলন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। রাঙ্গুনিয়া উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্যমতে, বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম এই শস্যভান্ডারে গত (২০২২-২০২৩) মৌসুমে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ১৯,০০০ মেট্রিক টন। যা গুমাই বিলের সাড়ে তিন হাজার হেক্টর জমি থেকে উৎপাদিত ধানের বাম্পার ফলনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ফলে কৃষকদের মতে, গুমাই বিলে উৎপাদিত শস্য পূর্বে বাংলাদেশের আড়াই দিনের খাদ্য চাহিদা মিটাতে সক্ষম হলেও বর্তমানে চার দিনের খাদ্য চাহিদা মিটাতে সক্ষম। গুমাই বিলকে আরো উৎপাদনমুখী করতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রায় ৩০ কোটি টাকার নতুন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যেমন- খাল পুনঃখনন, রাস্তা পুনঃসংস্কার, ব্রিজ কাম রেগুলেটর নির্মাণ এবং গুমাই বিল সন্নিহিত সৈয়দবাড়ী কলোনীতে কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। উপরোক্ত সম্ভাবনা সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুমাই বিলের উর্বর ভূমিকে বহুমূখী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করা সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্র

আলম, নূরুল। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ রাঙ্গুনিয়া-১৯৭১*, ঢাকা, রওশন আরা আলম, ২০১৩।

উপজেলা কৃষি অফিস, রাঙ্গুনিয়া।

কুদ্দুস, ফজলুতনেছা। "গুমাই পিতা: মরহুম আব্দুল বারী তালুকদার" ডা. ফজলুর রহমান (সম্পা.), *রাঙ্গুনিয়া স্মরনিকা-১৯৯৭*।

খালেদ, মোহাম্মদ (সম্পা.)। *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, আজাদী প্রিন্টার্স লিমিটেড, ১৯৯৫।

চক্রবর্তী, অনিমা। "ইরি ধানের কাহিনী" রাঙ্গুনিয়া হাই স্কুল পরিষদ (সম্পা.) *মানবিকা*। চট্টগ্রাম: ছাপাঘর, ১৯৬৮।

মেহের, বুজরুচ। *"রাঙ্গুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা"* ডা. ফজলুর রহমান (সম্পা.), *রাঙ্গুনিয়া স্মরনিকা- ১৯৯৭*।

বড়ুয়া, সুনীতি রঞ্জন। *রাঙ্গুনিয়ার ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রাম: ময়নামতি আর্ট প্রেস, ১৯৮৪।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নাম: মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, বয়স: ৫৫, পেশা: সেচ কর্মকর্তা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নাম: লোকন বিশ্বাস, বয়স: ৪৪, পেশা: উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা; ঠিকানা: মুরাদনগর, রাঙ্গুনিয়া; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: রাঙ্গুনিয়া কৃষি অফিস। তারিখ: ৭ অক্টোবর, ২০২৩।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নামঃ আব্দুল নবী, বয়সঃ ৭০, পেশাঃ কৃষক; ঠিকানাঃ পূর্ব সৈয়দবাড়ী, রাঙ্গুনিয়া; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ নিজ বাসবভন, তারিখঃ ১৫ আগস্ট, ২০২৩।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নামঃ সৈয়দ মনজুর মোরশেদ, বয়সঃ ৫৬, পেশাঃ লেখক ও গবেষক, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ (রাজনীতি বিজ্ঞান), ঠিকানাঃ পূর্ব সৈয়দবাড়ি, রাঙ্গুনিয়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ পাঠশালা পাঠাগার, রাঙ্গুনিয়া, তারিখঃ ১৪ আগস্ট, ২০২৩।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নামঃ ছালেহ আহমদ, বয়সঃ ৭২, পেশাঃ চাকরি (অব.), গ্রামঃ খিলমোগল (বিজয় নগর), ইউনিয়নঃ হোসনাবাদ, উপজেলাঃ রাঙ্গুনিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার- নামঃ ফরিদ আহমদ, বয়সঃ ৫৮, পেশাঃ সেক্রেটারি, চাষী সমবায় সমিতি; ঠিকানাঃ চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ নিজ বাসবভন, তারিখঃ ১৬ অক্টোবর, ২০২৩।

রহমান,ফজলুর (সম্পা.)। রাঙ্গুনিয়া স্মরনিকা- ১৯৯৭।

রাঙ্গুনিয়া স্টুডেন্ট ফোরাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, (সম্পা.), *কর্ণফুলী*, চট্টগ্রামঃ এস.এ ট্রেডার্স, ২০২১।

সাহা, ব্রজগোপাল। "গুমাই বিলের আত্নকাহিনী" রাঙ্গুনিয়া হাই স্কুল পরিষদ (সম্পা.) *মানবিকা*, চট্টগ্রামঃ ছাপাঘর, ১৯৬৮।